জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১১, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-জুন ২০২১

মধ্যযুগে বাংলার সমাজে নারী

মোছা. রূপালী খাতুন*

Abstract

In medieval times, patriarchy was deeply entranced in Bengali society. Strict restrictions were placed on the bodies, movements, legal and economic rights of women. In the Sultanate period the condition of Muslim women slightly better than their Hindu counterparts since Islam permits wealth and allow widow remarriage. But at that time society heavily stressed on enforced seclusion and veiling of women. In the Mughal period, in general society was oppressive to women. The common Hindu women had negligible rights of inheritance, child marriage was prevalent. Women of the upper class in general leisure, but also faced much greater restrictions, seclusion was strictly imposed. But there were certain recorded exceptions, as well as variations across religion, castes and regions. The position of women was slightly better among the Muslim and lower caste communities, though almost every community was already organized in accordance with the laws of patriarchy.

মধ্যযুগে বাংলার সমাজের গঠন, মানুষের আচরণ, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, নারীর কাজের পরিধি ও পরিবারে তাদের অবস্থান প্রভৃতি তৎকালীন সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এ সময় বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদলের মধ্য দিয়ে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটে। তবে মুসলিম বিজয়ের পর বাঙালি সমাজে নারীর স্থান বেশি অবনমিত হয়েছে। কেননা ধর্মের দোহাই দিয়ে বলা হয়েছে মুসলমান শাস্ত্রে মেয়েদের জন্য পর্দাপ্রথা ও অন্দরমহলে বসবাসের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই বাঙালি নারীরা অবরোধবাসিনী হয়েছিল। এরপর মুসলিম শাসনামলে সমাজ অনেক বেশি পুরুষতান্ত্রিক হয়ে ওঠে এবং পিতৃতন্ত্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণে নারীরা দুর্বিষহ জীবন যাপনে বাধ্য হয়। পর্দাপ্রথা, উপপত্নীপ্রথা, ক্রীতদাসপ্রথা, ক্রীতদাসী বিবাহে ধর্মীয় সমর্থন, বিবাহ-বিচ্ছেদে পুরুষের একপক্ষীয় অধিকার ইত্যাদি নারীর সামাজিক অধিকারকে সংকুচিত করে। তৎকালীন অভিজাত পরিবারের নারীরা গৃহ অভ্যন্তরে শিক্ষাসহ সীমিত পরিসরে কিছু সুযোগ-সুবিধা পায়। তবে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা নগর সমাজে ও ধর্মে নারীর স্থান ক্ষুণ্ন করে। অন্যদিকে জীবন সংগ্রামের তাগিদে গ্রামীণ সমাজে নিম্নবর্গের নারীকে অর্থ উপার্জন করতে দেখা যায়। এ অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার কারণে তাদের মধ্যে অবরোধপ্রথার শিথিলতা পরিদৃষ্ট হয় এবং দৈনন্দিন লোক-ধর্মচর্চায় তাদের প্রভাবও কিছুটা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও সার্বিকভাবে মধ্যযুগে বাঙালি নারীরা ছিল অধিকার বঞ্চিত, পরিবারের পুরুষ সদস্যের অধস্তন এবং সমাজে সকল দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া একটি শ্রেণি। এরূপে সুদীর্ঘ এক ক্রান্তিকাল অতিবাহিত হওয়ার পর উনিশ শতকে এসে সমাজ মানসে পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং বাঙালি সমাজ-সংস্কারকদের মননে নারী ভাবনার সূত্রপাত ঘটে। এভাবে বাংলার সমাজে নারী অগ্রগতি অত্যন্ত ধীর গতিতে শুরু হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা (১২০৪) হতে শুরু করে উনিশ শতকের রেঁনেসাস এর পূর্ব পর্যন্ত সময়কালে বাংলার সমাজে নারীর

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

অবস্থান বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এ কাল পর্বে বাংলার সমাজে ও পরিবারে নারীর ভূমিকা, নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি, শাস্ত্র ও ধর্ম প্রচারকগণ কর্তৃক নারীকে ব্যাখ্যা, নারীর অধিকার খর্ব করে তাকে অধস্তন করা ইত্যাদি বিষয় বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরে এর স্বরূপ নির্ণয় করার প্রত্যয় রয়েছে।

মধ্যযুগে বাঙালি নারীসমাজ সম্পর্কে জানার জন্য সমসাময়িক সাহিত্য ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থের উপর নির্ভর করতে হয়। কেননা বিজ্ঞানসম্মতভাবে সে সময়ের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র জানা যায় না। তাই মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যসহ অন্যান্য সাহিত্য ও আত্মজীবনী এবং আধুনিক গবেষকদের রচিত নানা তথ্যসমৃদ্ধ লেখনী দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহার করে প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনায় মানবিক বিদ্যা গবেষণা ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য পর্যালোচনামূলক বিশ্লেষণ রীতি (Analytical Method) অনুসরণ করার প্রচেষ্টা রয়েছে। এখানে বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণা কর্মটির উদ্দেশ্য হলো- মধ্যযুগে বাংলায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা, পর্দার নামে নারীকে গৃহে অন্তরীণ রাখা, সম্পত্তি ও শিক্ষাসহ নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং বিভিন্ন শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সমাজে নারীকে অধস্তন করে রাখার সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা। গবেষণার মাধ্যমে উক্ত বিষয়ে তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে ইতিহাসের শিক্ষার্থী, জেন্ডার সমতা নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং পাঠক শ্রেণির জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করা। সর্বোপরি বর্তমান নারীসমাজকে সচেতন করা।

প্রাচীনকালে বাংলায় নারী সম্পর্কে দ্বৈত ধারণা পাওয়া যায়, অর্থাৎ নারীকে দেখা হয়েছে একাধারে দেবী ও ক্রীতদাসী রূপে, অন্যদিকে সন্ত নারীও গণিকারূপে। তখনকার শাস্ত্রীয় নির্দেশে, সামাজিক আচরণে এবং সাহিত্যিক রূপায়ণে নারীর বিপরীতধর্মী চিত্র এবং নারী সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।[১] প্রকৃতপক্ষে বাংলা তথা ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের বসবাস ছিল বলে জানা যায়। দ্রাবিড় সমাজে নারীর কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য বেশি হওয়ায় এ সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। ক্রমে এ দেশে আর্যদের আগমন ঘটে। দ্রাবিড়দের মাতৃতন্ত্রের প্রভাব আর্যদের মধ্যে প্রথমদিকে কার্যকর থাকায় সমাজে নারীর স্থান কিছুটা উচ্চ পর্যায়ে ছিল। প্রথমাবস্থায় আর্য সমাজে নারীর সম-অধিকার ও মর্যাদার বিষয়ে বহু তথ্য প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। এ সময় মেয়েদের ধর্মীয় অধিকার স্বীকার করা না হলেও গার্গী, অপলা, মৈত্রেয়ী, শতরুপা, ঘোষা, লোপামুদ্রা, লীলাবতী, কাক্ষীবতী, বিশপলা, বধ্রিমতি, মুদগালিনী প্রমুখ নারী *বেদ* এর বহু শ্লোক রচনা করেছিলেন।[২] তবে অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হলো, প্রাচীনকালে আর্য জাতির মধ্যে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল। বৈদিক যুগে আর্যদের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ ও পশুপালনের উদ্ভাবন ঘটায় নারীরা। এ দুটি কাজ প্রথম দিকে নারীর দখলে ছিল, তাই পরিবারে নারীর ভূমিকা ছিল মুখ্য। কিন্তু ধীরে ধীরে সম্পত্তির মালিকানার উপর ভিত্তি করে সামাজিক অসাম্য দেখা দেয়, ক্রীতদাস প্রথার উদ্ভব ঘটে এবং নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে। এভাবে মেয়েরা পরিবার ও সমাজে নিজের গুরুত্ব হারাতে থাকে, অর্থাৎ নারীর সামাজিক অবস্থানের একটি পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

বৈদিক যুগের পর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর শাসকগোষ্ঠী বাংলা শাসন করেছে। ফলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টির পাশাপাশি সমাজে নারী ও পুরুষের ব্যবধানও সৃষ্টি হয়েছে। পাল শাসনামলে

বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে নারীর সম্মান কিছুটা রক্ষা পেয়েছিল। এ সময় ছেলের অবর্তমানে বাবার সম্পত্তি ও বংশ রক্ষায় মেয়ের অধিকার স্বীকৃত হয়। সমাজে পুত্র সন্তানের গুরুত্ব বেশি থাকলেও কন্যা সন্তান সমাজে সম্মানিত ছিল।[৩] তবে সার্বিকভাবে এ সময় নারীদের অধিকার প্রদান করা হয়নি। আবার সেন আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে বাংলার নারীসমাজের জীবনকাল মনুর মতাদর্শের ন্যায় তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। প্রথমত : পিতৃগৃহে বসবাসের সময়কাল, দ্বিতীয়ত : স্বামীগৃহে বসবাসের সময়কাল ও তৃতীয়ত : পুত্রসন্তানের গৃহে বসবাসের সময়কাল। তখন কন্যার বিয়েতে পিতা জামাতাকে যৌতুক প্রদান করতেন মর্মে জানা যায়।[৪] তৎকালে এক স্ত্রী গ্রহণ সামাজিক আদর্শ হলেও রাজা, সামন্তবর্গ, অভিজাত ও বিত্তবানরা অনেকসময় বহুপত্নী গ্রহণ করতেন। সেনযুগে নিম্ন শ্রেণির মেয়েদের নানা বৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা অর্জনের বিষয়টি এক নতুন মাত্রা যোগ করে। গ্রামীণ নিম্নবর্গের নারীরা মদ তৈরি করে, তাঁতে কাপড় বুনে, পশম শিল্পের কাজ, প্রসাধন ও সস্তা অলংকারাদি মাথায় নিয়ে ফেরি করে অর্থ উপার্জন করেন। অনেক নারী জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করেও অর্থ উপার্জন করতেন। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ ও অভিজাত বংশের নারীরা নিজেদেরকে সুন্দর পোশাক ও অলংকারে সজ্জিত করে অন্দরমহলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করত, স্বামীর মনোরঞ্জন ও সন্তান পালন ছিলো তাদের অন্যতম কাজ। তবে বিধবাদের জীবন ছিল দুর্বিষহ। মেয়েদের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের অধিকারও ছিলো না। সার্বিকভাবে প্রাচীন বাংলায় নারীর কোন স্বাধীন সত্ত্বা সমাজে স্বীকৃত ছিল না। নারীরা প্রতিভাবান হওয়া সত্ত্বেও তার বিকাশের সুযোগ খুব একটা ছিল না। শাস্ত্র মেয়েদের আচার-আচরণ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ প্রদান করে, ফলে নারীকে পুরুষের দয়া ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হয়েছে।

মধ্যযুগের শুরুতে বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অস্থিরতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। কেননা বহিরাগত তুর্কিদের কাছে সেনদের পরাজয় ঘটে। একটি নতুন শাসনের সূত্রপাতে সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এরই মধ্যে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্মসহ কয়েকটি অসাম্প্রদায়িক উদার মতবাদের বিকাশ লক্ষ করা যায়। বৈষ্ণবদের মধ্যে নারীর সাক্ষরতা ও শিক্ষার প্রসার ঘটে। তবে প্রথমদিকে এ সমাজে নারী-পুরুষ তেমন ভেদাভেদ না থাকলেও ধীরে ধীরে পুরুষ গুরু (মেয়েদের গুরু হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়নি) দ্বারা নারীর গুরুত্ব কমতে থাকে। অর্থাৎ বৈষ্ণব সংস্কার আন্দোলনে নারীর কিছু কিছু বাহ্যিক অধিকার স্বীকৃত হলেও প্রকৃত নারী ভাবনায় ও ভূমিকায় খুব একটা পরিবর্তন সাধন হয়নি। অন্যদিকে তৎকালে স্মার্ত সাহিত্যের (বিচার বিধান) আর্বিভাব ঘটে। এখানে মানুষের তথা নারীর গতিবিধি ও কাজ করার পূর্ণাঙ্গ রীতিনীতির বিস্তৃত বিবরণ দেয়া হয়, যা মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলাচলের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় এবং জীবনের স্বাভাবিক ব্যাপ্তিকে সংকুচিত করে।[৫] এভাবে দেখা যায় তৎকালে নারীরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের অধস্তন হয়েই থেকে যায়।

মধ্যযুগে সাধারণ গ্রামাঞ্চলের নারীরা তাদের সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্নার কথাগুলি লৌকিক ধারায় অত্যন্ত সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন বারমাস্যা বা চর্তুমাস্যাতে (এক প্রকারের কবিতা)। এখানে পতিনিন্দার নানা দিক তথা স্বামীর দোষত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার কথা মেয়েরা অবলীলায় বলেছেন। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যে ফুল্লরা ও খুল্লনার বারমাস্যা, *পদ্মপুরাণে* পদ্মাবতীর বারমাস্যা, *বিদ্যাসুন্দরে* বিদ্যার বারমাস্যা, আলাওলের *পদ্মাবতী*তে নাগমতীর বারমাস্যা প্রভৃতি মধ্যযুগের সাহিত্যের অন্যতম উপাদান যার মাধ্যমে নারীরা পুরুষের বিভিন্ন নেতিবাচক দিক তুলে ধরেছেন।[৬] এছাড়া মেয়েদের

ব্রতকথা, প্রবাদবাক্য, মেয়েলি ছড়া ও রূপকথা মধ্যযুগের সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা থেকে তখনকার সমাজ ও নারীর অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে দীর্ঘ দিন ধরে বাংলায় হিন্দুদের রাজত্ব ছিল। তাই বাংলায় ইসলাম ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম– এ দুটি প্রধান স্রোতধারা, যা দ্বারা এদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক কাঠামো গঠিত। দেখা যায় যে, তেরো শতকে ইন্দো-মুসলিম শাসনামলেও বাংলার সমাজে নারীর অবস্থার উন্নয়ন ঘটেনি। কারণ ইসলাম ধর্ম ও সংহতিতে নারীদের অবস্থা বৈপ্লবিকভাবে উন্নত করার মতো কোন ব্যবস্থা ছিল না। মুসলমান শাসকরা লেখাপড়া, সামাজিক মর্যাদা কোন ব্যাপারেই বাঙালি নারীদের মধ্যে নতুন ধারণা এবং রীতি প্রবর্তন করতে পারেননি। এসবের সাথে কয়েক শতক পর ইংরেজ আমলে যে পরিবর্তন এসেছিল তার তুলনা করলেই বাঙালি নারীদের ইতিহাসে ইন্দো-মুসলিম আমলের প্রভাব কত সামান্য তা বোঝা যায়।[৭] মূলত মধ্যযুগে মুসলমান শাসনামলে বাংলার সমাজে নারীর মর্যাদার কতগুলি বিশেষ দিক লক্ষণীয়। প্রথমত, নারীরা ছিল সাধারণত পুরুষের উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত, তারা গৃহে পর্দার অন্তরালে বসবাস করতো। তৃতীয়ত, নারীর উচ্চশিক্ষা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমাজের উচ্চস্তরে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাদের কাজকর্ম গৃহ অভ্যন্তরেই পরিব্যাপ্ত ছিল। চতুর্থত, নারীর খুব একটা আর্থিক সক্ষমতা ছিল না, যা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান। এতদ্সত্ত্বেও সে যুগে বহু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীর দৃষ্টান্ত রয়েছে যারা তাদের অসামান্য ব্যক্তিত্বের গুণে পুরুষের উপর আধিপত্য করেছেন। সমাজে তেজস্বিনী নারীর দৃষ্টান্তও বিরল ছিল না। শাসকদের স্ত্রীরা রাজকীয় মর্যাদায় বসবাস করতেন, সুলতানের (শাহজাদার) মা পেতেন সবচেয়ে বেশি মর্যাদা। হেরেমের নারীদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন ছিল উন্নত। অনেক হেরেমে নারীদের জন্য মসজিদ (Masjid-i-Khas) থাকত। মধ্যযুগে পূর্ব বাংলায় মুসলিম স্থাপত্য নির্মাণে নারীর ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। ঢাকার নারিন্দাতে বখ্ত বিনতের মসজিদ স্থানীয়ভাবে 'নারিন্দা মসজিদ' নামে খ্যাত- এটি মারামাতের কন্যা বখ্ত বিনত তৈরি করেন (১৪৫৬ খ্রি.)। সুলতানি আমলেও গৌড়ে বিবি মালতী একটি মসজিদে ওজু করার জন্য ঘর তৈরি করেন।[৮] তৎকালে দেখা যায় অনেক সময় শাসক তাঁর কন্যাকে পুত্র অপেক্ষা অধিকতর যোগ্য মনে করলে, তাঁকে (কন্যা) পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করতেন, যদিও এ সকল দৃষ্টান্ত অত্যন্ত অপ্রতুল।

হোসেন শাহী শাসনামলে (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রি.) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা বিরাজ করতো। স্ত্রীর সহযোগিতায় অনেক সময় শাসকরা পারিবারিক কর্মকাণ্ড, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতেন। এ সময়ের সাহিত্যে দেখা যায়, বাংলার নারীরা তখন সুতা ও পাট দিয়ে তৈরি সুন্দর বস্ত্র, বিভিন্ন রকমের অলংকার এবং সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করতেন। তারা সেজেগুঁজে চুল বেঁধে, বেণিতে নানা রকমের ফুল ও ময়ূরের পাখা লাগাতেন।[৯] সুলতানি আমলে লিঙ্গ বৈষম্য বা নারী পুরুষে পার্থক্য খুব কম করা হতো। কিন্তু তখন সমাজে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল দুটি। যথা- ১. উপপত্নী প্রথা ও ২. পুরুষের বহুগামিতা। পুরুষদের মধ্যে বহুবিবাহ তখন হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজে প্রচলিত প্রথার মতোই বিরাজমান ছিল। ফলে সমাজের শান্তি নষ্ট হতো, অযথা দ্বন্দ্ব কলহের সৃষ্টি হতো। পাশাপাশি সুন্দরী দাসীদের প্রচুর চাহিদা পরিলক্ষিত হয় যা সমাজের জন্য ছিল অত্যন্ত লজ্জাজনক।[১০] হোসেন শাহী শাসনামলে দেখা যায় বিধবা হওয়ার পর কিছুদিন মুসলমান নারীরা খাওয়া-দাওয়া, বস্ত্রালংকার প্রভৃতির ক্ষেত্রে খানিকটা ত্যাগ স্বীকার করত। সমকালীন সাহিত্য ও অন্যান্য প্রমাণ থেকে অনুমান করা যায়, প্রাচীনকালের মতো

এসময়ও বিয়েতে নারীর মর্যাদা এবং স্বাধিকার স্বীকৃত হয়নি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে পুরুষই ছিলেন প্রধান নিয়ন্ত্রক। ধনীরা স্ত্রীদের বস্ত্র ও অলংকারে সাজিয়ে রাখতেন অর্থাৎ ভালোভাবে ভরণপোষণ করতেন, বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে দাসীর মতো আনুগত্য আশা করতেন। এমনকি কোনো কারণে তাদের জীবন দুর্বিষহ হলেও বিবাহ ভাঙ্গার মতো অধিকার নারীদের ছিল না। অন্যদিকে গরিব নারীরা অর্থনৈতিক কাজে পুরুষদের সহযোগিতা করতেন। মধ্যযুগের সাহিত্যে নিম্নশ্রেণির নারীরা তাঁত বিক্রি, চাঙারি তৈরি আবার অনেককে গণিকা বৃত্তিতেও নিযুক্ত হতে দেখা যায়। তৎকালে নৃত্যগীতবাদ্য ও অভিনয় কলার সাথে নারীরা সম্পৃক্ত থাকার প্রমাণও পাওয়া যায়। আবার বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* (চৌদ্দ ও পনেরো শতক) রাধা ও কৃষ্ণের অনেকগুলি পরিচারিকা ছিল এবং প্রত্যেকের কাজ নির্দিষ্ট করা ছিল। *মনসা বিজয়ে* হাসান-হুসেনের সাত বাঁদির উল্লেখ আছে। *চণ্ডীমঙ্গলে* ফুল্লরাকে হাটে হাটে মাংস বিক্রি করতে এবং ভারতচন্দ্রের কাব্যে ঈশ্বরী পাটনীকে নৌকা পারাপার করে জীবিকা নির্বাহ করতে দেখা যায়। মধ্যযুগে মেয়েদের দূত হিসেবে খবর আদান-প্রদান করে অর্থ উপার্জন করার খবর জানা যায়। মেয়েদের গণিকাবৃত্তির কথা শাহ মুহম্মদ সগীরের *ইউসুফ জুলেখা* (পনেরো শতক), হলায়ুধ মিশ্রের *সেক শুভোদয়া* (ষোলো শতক), দোনাগাজির *লালমতি সয়ফুল মুলুক* (সতেরো শতক) প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।[১১] উল্লেখ্য সমাজের নিম্নশ্রেণির মেয়েরা জীবিকা নির্বাহের জন্য এ সকল পেশা অবলম্বন করতেন, যে কারণে তাদের মধ্যে অবরোধ প্রথা ছিল না। তারা পুরুষ তথা স্বামীর কাছ থেকে বস্ত্র-অলংকার পেতেন না, তাই তারা নিজেদের বক্তব্য এবং প্রতিবাদ উচ্চকণ্ঠেই প্রকাশ করতেন। তৎকালে মুসলমান সমাজে ও উচ্চবর্গীয় মেয়েদের মসজিদে যাওয়া, জুম্মার নামাজে শরীক হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। অন্যদিকে গ্রামীণ জীবনে মেয়েরা নিয়মিত দরগা জিয়ারত ও পীর মুর্শিদের সেবাতে অংশগ্রহণ করত। উল্লেখ্য উনিশ শতকের শুরুর দিকে উইলিয়ম কেরি মেয়েদের কথোপকথন এবং কোন্দলের যে নমুনা সংকলন করেন, সেটি থেকে নারীর মুখ যে যথেষ্ট তীক্ষ্ম ছিল, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[১২] এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন নারীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে নারী নিজে অর্থ উপার্জন করে এবং স্বামী বা সংসারের অন্য কোন সদস্যের উপর নির্ভরশীল না হয়, সে তাঁর যৌক্তিক অধিকারের কথাগুলি বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করতে পারে। উল্লেখ্য তৎকালে মুসলিম মেয়েদের পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার ছিল। এ আর্থিক সঙ্গতি তাকে পরাধীনতা থেকে অনেকটা রক্ষা করেছে এবং স্বামীর উপর নির্ভরশীলতা সহনীয় ও সম্মানজনক করে তুলেছিল।

অন্যদিকে তদানীন্তন বাংলার হিন্দু সমাজে নারীদের সম্পত্তিতে কোন অধিকার ছিল না। ফলে তাকে সম্পূর্ণরূপে স্বামীর উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে। হিন্দু সমাজে নারী অত্যন্ত শোচনীয় জীবন যাপন করত। পরিবার ছিল কঠোরভাবে পিতৃতান্ত্রিক এবং স্ত্রীকে সর্বদা স্বামীর আজ্ঞাবহ থাকতে হতো।[১৩] কবি ভারতচন্দ্র হিন্দু সমাজে নারীদের অমর্যাদাজনক অধীনতার কথা উল্লেখ করে বলেন, "একটা মেয়ের জীবন খুব সুখের নয় ; সে সর্বদা পরনির্ভরশীল এবং তাকে অন্যদের বোঝা বহন করতে হয়"।[১৪] একজন হিন্দু নারীর জন্য স্বামীর আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হলে, তার পক্ষে দাঁড়াবার কোনো জায়গা থাকত না যেখানে সুখ ও শান্তিতে তিনি জীবন যাপন করতে পারেন ; এমনকি তাঁর পৈতৃক বাড়িতেও নয়। বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথা হিন্দু নারীদেরকে আরও বেশি অসহায় করে পুরুষের উপর নির্ভরশীল করে তোলে। দশ বা এগারো বছর বয়স হওয়ার পূর্বেই হিন্দু মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় তাদের নিজস্ব কোনো ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারেনি। চার্লস গ্রান্ট মন্তব্য করেন, মেয়েদের যে বয়সে বিয়ে হয় তখন তাদের যুক্তি-বুদ্ধিতে বিকাশ হয় না বরং তারা মায়ের 'জেনানা'

থেকে নিজেদের 'জেনানা'য় সরাসরি প্রবেশ করে।[১৫] বাল্যবিবাহের কারণে মেয়েদের পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটত। আবার প্রয়শই স্বামী ও স্ত্রীর বয়সের অনেক ব্যবধান হতো, যা সমাজের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনত। অনেক সময় বিবাহযোগ্য কন্যার গরিব পিতা-মাতা স্ববর্ণে কুলীন পাত্রের কাছে কন্যা সম্প্রদানে ব্যর্থ হয়ে মাঝে মাঝে বিবাহ-ব্যবসায়ী ঘটকের নৌকায় নিজ কন্যাকে তুলে দিতেন। এদের মধ্যে কিছু মেয়ের বিয়ে হতো, কিছু বৈষ্ণব মহান্তদের সেবাদাসী ও বোষ্টমি হতো, বাকিদের জায়গা হতো পতিতালয়ে।[১৬] মধ্যযুগে বাংলার কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ ছিল সাধারণ নিয়ম। কারণ উচ্চবর্ণের ও সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হওয়ায় নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বিয়ের ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের চাহিদা খুব বেশি ছিল। বহুবিবাহ মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা নষ্ট করে এবং তাদের জীবনকে দুঃখময় করে তোলে।

মধ্যযুগে হিন্দু বিধবারা অতি দুঃসহ জীবনযাপন করতেন। অবশ্য সন্তানগণ বড় হলে এবং তারা মায়ের প্রতি যত্নবান হলে তা ছিল ভিন্ন ব্যাপার। বিধবা জীবনের দুর্বিষহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য এসময়ও প্রতিবছর অনেক হিন্দু নারী তাদের মৃত স্বামীর সাথে সহমরণে উদ্বুদ্ধ হয়। আবার হিন্দু সমাজে কন্যার চাইতে পুত্র সন্তানের কদর বেশি ছিল। প্রাচীন কালের ন্যায় মধ্যযুগেও প্রায় সকল সমাজে পুত্র সন্তানের চেয়ে কন্যাসন্তানের গুরুত্ব কম ছিল। এমনকি কোথাও কোথাও কন্যা সন্তানকে হত্যা করা হতো। কন্যা জন্মকে দুর্ভাগ্য হিসেবে বিবেচনার কাহিনী পাওয়া যায়।[১৭] তবে এ ধারার বিপরীতে এমন তথ্যও আছে যে, কন্যার জন্ম অনেকের কাছে আনন্দের ছিল। বিপ্রদাস পিপলাই এর *মনসাবিজয়* (পনেরো শতক), মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* (ষোলো শতক), দ্বিজ মাধবের *মঙ্গলচণ্ডীর গীত* (ষোলো শতক), আলাওলের *পদ্মাবতী* (সতেরো শতক) ও মানিকরাম গাঙ্গুলীর *ধর্মমঙ্গল* (আঠারো শতক) কাব্যে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ উপলক্ষে আনন্দ করার উল্লেখ আছে।[১৮] তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় বিয়েতে যৌতুক প্রদানের ব্যাপারটিও পরিলক্ষিত হয়। কামতার (কামরূপ) শাসনকর্তা King Sukranka (১৪০০-১৪১৫ খ্রি.) কন্যার বিয়েতে দুটি হাতি, কয়েকটি ঘোড়া, প্রচুর সোনা ও রূপা যৌতুক হিসেবে প্রদান করেন।[১৯] অবশ্য তখন সমাজ যৌতুকপ্রথা মেনে নেয়নি এবং ধর্মীয়ভাবেও যৌতুক সমাজে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তবে ইসলাম ধর্মমতে মুসলমানদের জন্য বিয়ের সময় কণেকে 'মোহরানা' শোধ করার বিধান প্রচলিত ছিল।

অন্যদিকে আর্থিক সচ্ছলতা, উচ্চশ্রেণির ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে বিবাহের ফলে তৎকালীন সমাজে মুসলমান মেয়েরা হিন্দু মেয়েদের ন্যায় অতটা অসহায় ও পুরুষের উপর নির্ভরশীল ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, প্রতিভাবান ও তেজস্বিনী জিন্নাতুননেছা তাঁর স্বামী উড়িষ্যার সহকারী শাসনকর্তা সুজাউদ্দিনের অত্যধিক নারী আসক্তির স্পৃহা সহ্য করতে না পেরে তাঁর সাথে একত্রে বসবাস করতে অস্বীকার করেন। তিনি পৃথকভাবে মুর্শিদাবাদে বাস করতেন এবং স্বামী থাকতেন উড়িষ্যায়।[২০] জিন্নাতুননেছার কন্যা দুরদানা বেগম ছিলেন সরফরাজ খানের অধীনে উড়িষ্যার নায়েব সুবেদার দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের স্ত্রী। দুরদানা বেগম স্বামীর উপর নানা বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মধ্যযুগে নারীর জন্য পর্দাপ্রথা ও আবরোধপ্রথা সমাজে আভিজাত্য ও শিষ্টাচার বলে গণ্য করা হতো। যদিও ইসলাম ধর্মে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য আব্রু রক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলিম শাসকরা শুধু নারীর পর্দা বা আব্রুর উপরই দৃষ্টিপাত করেন। ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৯) একডালা দুর্গের উপরে একজন নারীকে মুখমণ্ডলের পর্দা সরানো অবস্থায় দেখতে পেয়ে সাথে সাথে তাঁর সাম্রাজ্যে মেয়েদের ধর্মানুযায়ী পর্দা পালন করার নির্দেশ প্রদান করেন।[২১] ফিরোজ শাহ তুঘলক ও সিকান্দার

লোদী (১৪৮৯-১৫৭৭) নারীর জন্য ধর্মীয় পবিত্র স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ করেন। এ সময় বোরকা এবং পর্দা ঘেরা গাড়ি ছাড়া মেয়েদের চলাফেরা বন্ধ ঘোষণা করেন। ইউরোপীয় পর্যটক বারবোসা পনেরো শতকে বাংলার মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে বলেন যে, উচ্চশ্রেণির ব্যক্তিরা তাদের নারীদেরকে এ সময় আন্দরমহলে আটক অবস্থায় রেখেছিল। তিনি আরও উল্লেখ করেন, এ সময় মেয়েরা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত, স্বর্ণখচিত রেশমি কাপড় এবং হীরা বসানো স্বর্ণ অলংকারে ভূষিত থাকতো।[২২] আঠারো শতকে ইংরেজ লেখক ভেরেলেস্ট লিখেছেন, নারীদেরকে অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখা এক প্রকার আইন, যা অপরিবর্তনীয়। সমগ্র ভারতব্যাপী এ রীতি প্রচলিত ছিল এবং এটা মানুষের ধর্ম ও শিষ্টাচারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল। আমীর খসরু তাঁর সাত বছর বয়সী কন্যাকে উপদেশ দিয়ে বলেন, পর্দা পালনকারী নারী সমাজে প্রশংসা পায় এবং যারা বেপর্দা করে রাস্তায় বের হয় তারা অসম্মানিত হয়।[২৩] উল্লেখ্য তদানীন্তন বাংলার সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। দেখা যায় বাল্যবিবাহের কারণে বাঙালি নারীরা তখন শিক্ষাদীক্ষায় এবং সংস্কৃতিতে পিছিয়ে পড়ে। কিন্তু অভিজাত পরিবারের নারীরা শিক্ষা, জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন করেন। তবে সাধারণভাবে মেয়েরা বেআবরু হওয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের চোখেই অমর্যাদাকর ছিল।[২৪] এজন্য উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণির হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নারী পর্দা এবং অবগুণ্ঠন কঠোরভাবে মেনে চলতো। গোলাম হোসেনের মতে, নবাব আলীবর্দী খান তাঁর স্ত্রীর নিকট পূর্বে খবর না পাঠিয়ে কখনও জেনানা মহলে প্রবেশ করেননি, কেননা সে সময়ে অন্য নারীরা সেখানে উপস্থিত থাকতে পারে। এমনকি নবাব আলীবর্দী খানের প্রাসাদে আশ্রিত আফগান মহিলারা যতদিন পর্যন্ত হারেমে বসবাস করেছে ততদিন তিনি প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজ উদ-দৌলাকেও পূর্ব অনুমতি ব্যতিত তাঁর মাতামহীর সাথে দেখা করতে নিষেধ করে দেন। উল্লেখ্য সিরাজ উদ-দৌলার মাতা আমেনা বেগমও পর্দার অন্তরালে বসবাস করতে অভ্যস্ত ছিলেন।[২৫]

মধ্যযুগে হিন্দু সমাজের নারীদের জন্য যে অবগুণ্ঠন বাধ্যতামূলক ছিল, হিন্দু কবিদের বর্ণনায় তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রামপ্রসাদ লিখেন, "আমাদের সমাজে এটা কেমন ব্যাপার যে, একজন তরুণী অবগুণ্ঠনহীনা"।[২৬] রাসসুন্দরী দেবী (জন্ম ১৮১০ খ্রি.) নিজ শশুরবাড়ি ফরিদপুরের একটি ছোট জমিদারবাড়ির অন্তঃপুরে পর্দার কঠোরতার বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, তাঁর (রাসসুন্দরী দেবী) স্বামী দিনের বেলায় অন্তঃপুরে স্ত্রীর সাথে দেখা পর্যন্ত করতে আসতে পারত না। এ সকল তথ্যে তৎকালীন সমাজে নারীদের কঠোর পর্দাপ্রথার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার আঠারো শতকের শেষে ১৭৯২ খ্রি. চার্লস গ্রান্ট পারিবারিক জীবনে স্ত্রীর পরাধীনতার প্রসঙ্গটি বিশদভাবে আলোচনা করেন। গ্রান্ট স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের সাথে তুলনা করেন। তবে পর্দাপ্রথার কঠোরতা সমাজে কতখানি ছিল সে বিষয়ে দ্বিমতও পোষণ করা যায়। কেননা বারবোসা একদিকে মুসলমান নারীদের অবরোধের কথা বলেছেন আবার তিনি তাদের সৌন্দর্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, মুসলমান নারীরা যদি সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকতেন তাহলে বিদেশি পর্যটকরা কীভাবে তাদেরকে দেখতে পান এবং তাদের বাহ্যিক সৌন্দর্য ও পোশাক-পরিচ্ছদের বিষয় জানতে পারেন। এছাড়া নারীরা তখন পুরুষের সাথে সাহিত্য-জ্ঞানের প্রতিযোগিতা করতেন। অভিজাত পরিবারের মেয়েদের রাজনীতি করার স্বাধীনতা ছিল, সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারায় তাঁরা নিজেদেরকে অবগাহিত করতেন এবং বিবাহ অনুষ্ঠানাদি এমনকি শোভাযাত্রাতেও অংশগ্রহণ করতেন।[২৭] এসকল দৃষ্টান্ত থেকে অনুমান করা যায় যে, মুসলমান নারীরা গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁরা গৃহের বাইরেও যেতে

পারতেন। এক্ষেত্রে তাদের পর্দা পালন করতে হতো। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এসময় মুসলমান নারীরা সমাজে যথেষ্ট সম্মানের অধিকারী ছিলেন বলেও জানা যায়।

মুঘল শাসনামলে অভিজাত পরিবারের নারীরা বেশ প্রভাবশালী ছিলেন। এসময়ে এসেও সাধারণ মুসলমান সমাজে এমনকি অভিজাত পরিবারের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল, তবে হিন্দু নারীর তুলনায় মুসলিম নারীদের অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে বিয়ে হতো।[২৮] মুঘল সমাজের নারীরা তাদের পূর্ববর্তীদের তুলনায় যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। গুলবদন বেগমের বর্ণনা থেকে জানা যায়, হুমায়ুনের রাজকীয় হারেমের নারীরা পুরুষ বন্ধু ও দর্শনার্থীদের সাথে সম্রাটের পূর্বানুমতি ব্যতীত সাক্ষাৎ লাভ করতে পারতেন। তাঁরা মাঝে মাঝে পুরুষের পোশাক পরিধান করে বাইরে যেতেন, পোলো খেলতেন, সংগীতে অংশগ্রহণ করতেন এবং তীর ধনুক চালনায় পারদর্শী ছিলেন।[২৯] মুসলিম শাসনামলে উচ্চ শ্রেণির শিক্ষিত ও প্রতিভাবান নারীরা সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা লাভ করেন এবং তাদের যুগের সামাজিক জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। উল্লেখ্য, নবাব সুজাউদ্দিনের কন্যা এবং সরফরাজ খানের ভগ্নি নাফিসা বেগম ছিলেন একজন উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন নারী। তিনি সমাজে ব্যাপক সম্মান অর্জন করেন। বাংলা প্রদেশে মীর্জা নাথানের জায়গীরে যখন তাঁর বোন আসতেন তখন শিকদার ও জমিদারগণ তাঁকে সম্বর্ধনা এবং অর্থকড়ি ও অন্যান্য জিনিসপত্র উপহার দিতেন। জাহাঙ্গীরনগরের সুবাদার ইব্রাহিম খানের স্ত্রী তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে আতিথেয়তা প্রদান করেন। মীর্জা নাথান নিজের বোনকে মায়ের মত শ্রদ্ধা করতেন। বহু মূল্যবান জিনিসপত্র এবং দাসদাসী বোনকে উপহার দেন।[৩০] প্রকৃতপক্ষে সুলতানি আমলের তুলনায় মুঘল আমলে এসে বাঙালি নারীর সার্বিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়।

নবাবী আমলে বাংলা প্রদেশে নারীদেরকে প্রশাসন পরিচালনায় ও রাজনীতিতে ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। নবাব আলীবর্দী খানের স্ত্রী শরফুন্নেসা স্বামীর সাথে যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ এবং রাজ্যশাসন বিষয়ে একজন মূল্যবান উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেন। নবাব আলীবর্দী খান স্বয়ং বিজ্ঞ, বিচক্ষণ এবং অসাধারণ মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন; তবুও স্ত্রীর পরামর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। চার্লস স্টুয়ার্ট উল্লেখ করেন, নবাব আলীবর্দী খান কর্তৃক মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় শরফুন্নেছা বেগম সর্বপ্রধান রাজকর্মচারী হিসেবে কাজ করেন।[৩১] আলীবর্দী খান শরফুন্নেসার পরামর্শে দৌহিত্র সিরাজ উদ-দৌলাকে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। নবাব সিরাজ উদ-দৌলার শাসনকালে শরফুন্নেসার এ প্রভাব অব্যাহত ছিল। কেবল তাঁরই মধ্যস্থতায় নবাব কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে আনীত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারি হলওয়েল ও অন্যান্য বন্দিদের মুক্তি দেন। শরফুন্নেছার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে হলওয়েল লিখেছেন যে, "তিনি ছিলেন এমন একজন নারী যাঁর জ্ঞান, মহানুভবতা, বদান্যতা ও অমায়িক ব্যবহার প্রভৃতি গুণের মধ্যে নারী জাতির উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা প্রতিফলিত হয়েছে"।[৩২] মূলত নবাবী আমলে এসে বাংলার নারীদের কার্যক্রমের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়, যা তাদের আত্মউন্নয়নের একটি সদর্থক দিক।

আলীবর্দী খানের জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসেটি বেগম একজন উচ্চশিক্ষিত ও প্রতিভাবান নারী ছিলেন । স্বামী নওয়াজিশ মুহাম্মদ খানের মৃত্যুর পর তিনি বাংলা সুবার দিওয়ান হিসেবে বিচক্ষণতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তবে ঘষেটি বেগম খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাই সিরাজ উদ-দৌলাকে মসনদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র শুরু করেন। অন্যদিকে নবাব আলীবর্দী খানের কনিষ্ঠ

কন্যা ও নবাব সিরাজ উদ-দৌলার মাতা আমিনা বেগম তাঁর সুরুচি ও শিষ্টাচারের গুণে সে যুগের সমাজ জীবনের উপর গভীর প্রভাব রেখেছেন। তিনি রাজকানয়ার নামের এক ক্রীতদাসীকে শিক্ষিত করে তোলেন এবং পরে তাকে লুৎফুন্নেছা নাম দিয়ে স্বীয় পুত্র সিরাজের সঙ্গে বিয়ে দেন।[৩৩] আমেনা বেগম প্রশাসনিক বিষয়েও ভূমিকা রাখেন। সিরাজ উদ-দৌলার স্ত্রী লুৎফুন্নেছা ছিলেন তৎকালে নারীদের আদর্শ। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়ের উচ্চঅন্তঃকরণ সম্পন্ন নারী, যিনি সবসময় বিপদে আপদে স্বামীর অনুগামিনী ছিলেন। এছাড়া সেসময় সংগীতনিপুণ মুন্নী বেগম সামান্য অবস্থা হতে স্বীয় গুণাবলির দ্বারা মীর জাফরের প্রধান স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেন। মীর জাফরের নবাবী আমলে মুন্নী বেগম শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন। এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পর নাবালক নবাবদের[৩৪] অভিভাবক হিসেবে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। বিবেকহীন ও উচ্চাভিলাষী হলেও মুন্নী বেগম খুব কর্মক্ষম, বুদ্ধিমতি ও দৃঢ় চরিত্রের নারী ছিলেন।

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে তথা বাংলায় মুসলমান শাসনামলে অনেক নারী সাহস, শক্তি ও বীরত্বের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। সুলতান রাজিয়া তৎকালীন পর্দাপ্রথা ছেড়ে পুরুষের বেশ ধারণ করে মাথায় পাগড়ি, পায়জামা, কোটি এবং কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে সুলতানদের চিরাচরিত পোশাকে সজ্জিত হয়ে প্রকাশ্যে রাজ দরবারে রাজকার্য পরিচালনা করেন।[৩৫] উল্লেখ্য ইলতুতমিশ পুত্র সন্তান থাকা সত্ত্বেও যোগ্যতা বেশি থাকায় কন্যা রাজিয়াকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন। অন্যদিকে আহাম্মদনগরের চাঁদ সুলতানার বীরত্বগাঁথা সুবিদিত। মহব্বত খাঁর বিরুদ্ধে নূরজাহানের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ ইতিহাসের একটি সুপরিচিত ঘটনা। দারার কন্যা ও শাহজাদা মুহম্মদ আজমের স্ত্রী জাহানজেব বানু (জানী বেগম) ১৬৮২ সালে এক যুদ্ধে মারাঠাদের হটিয়ে দেন।[৩৬] আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে পূর্ব বাংলার ফরিদপুর জেলার কার্তিকপুর গ্রামের মুন্সী ইমামদ্দী চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী চাঁদবিবি রাজ্য রক্ষার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। একটানা দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধ করে শত্রুর নিকট পরাজয় বরণ করলেও তাঁর বীরত্ব ছিল গৌরবময়। আবার হাজী মোহাম্মদ মোহসিনের বোন মন্নুজান খানম (১৭১৭-১৮০৩) নিজের জমিদারি দেখাশোনা করতেন এবং মোহসিন ট্রাস্ট ফান্ড তাঁরই সৃষ্টি।[৩৭] এ সকল ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম শাসনামলে বাংলার নারীরা হেরেমে সাধারণ পর্দাপ্রথার মধ্যে অবরুদ্ধ ও পুরুষদের উপর নির্ভরশীল থাকা সত্ত্বেও তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এক্ষেত্রে পুরুষদের ইতিবাচক ভূমিকার কথা স্বীকার করতে হবে। কেননা যে সকল নারী বিভিন্নভাবে সমাজে ভূমিকা রেখেছেন তাঁরা অধিকাংশই তাদের স্বামী, পিতা বা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সহযোগিতার মাধ্যমে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তাই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ যদি প্রগতিশীল হয় তবে সেখানে নারী উন্নয়ন সম্ভবপর হয়।

মধ্যযুগে হিন্দু সমাজেও প্রতিভাবান নারীর উপস্থিতি লক্ষণীয়। বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় যে, পাঁচ বছর বয়স্ক পদ্মাবতি ছত্রশালায় গুরুর কাছে পড়তে যান এবং সাত বছর শিক্ষালাভ করে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। দৌলতউজির বাহরাম খাঁর *লাইলী-মজনু* (ষোড়শ শতক বা তার পরে) কাব্যে দেখা যায়, ছেলে ও মেয়েরা একইসাথে পাঠশালায় পড়ছে। সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশে* (ষোড়শ শতক) ও দোনাগাজীর *সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামানে* (সতেরো শতক) বিদুষী কন্যার পরিচয় পাওয়া যায়। *চণ্ডীমঙ্গলের* লহনা, খুল্লনা ও লীলাবতীর চিঠি লেখা ও পড়ার মতো বিদ্যা ছিল।[৩৮] রাধা-কৃষ্ণের সখি ও পরিচারিকারা কবিতা রচনাসহ নানা কলাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* (অষ্টাদশ শতক) কাব্যের নায়িকা বিদ্যা সবচেয়ে বেশি বিদুষী ছিলেন। তিনি ব্যাকরণ, অভিধান,

সাহিত্য, নাটক, অলংকার, ষড়দর্শন, পুরাণ, সংহিতা, স্মৃতি এবং আরও কিছু শিক্ষা করেন।[৩৯] এ সকল তথ্য থেকে জানা যায় যে, তৎকালে উচ্চশ্রেণির হিন্দুদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিত নারী ছিলেন। তাঁরা সাহিত্য বিষয়ে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতাও করতেন। তৎকালে নারীশিক্ষার প্রচলনের কথা শুধু সাহিত্যে নয় বরং বাস্তবেও পরিদৃষ্ট হয়। যেমন- চন্দ্রাবতী (ষোড়শ শতক) ও রহিমুন্নেসা (আঠারো শতক) কবিতা রচনা করেন এবং জাহ্নবাদেবী (সতেরো শতক) ও হেমলতা দেবী (সতেরো শতক) বৈষ্ণব শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। আবার হটী বিদ্যালঙ্কার (মৃত্যু আনু. ১৮১০ খ্রি.) ও হটু বিদ্যালঙ্কার (আনু. ১৭৭৫-১৮৭৫) এর মতো পণ্ডিতদের অস্তিত্ব সমাজে বিদ্যমান ছিল।[৪০] নাটোরের জমিদার পরিবারের রানী ভবানী একজন খ্যাতনামা নারী ছিলেন। জমিদারি শাসনে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার এবং জনসাধারণের কল্যাণে বদান্যতার জন্য তিনি সে যুগের সমাজে উচ্চ আসন লাভ করেন। জনৈক জমিদারের স্ত্রী জয়দুর্গা চৌধুরাণী রংপুরের একজন অত্যাচারী জমিদার দেবী সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। অন্য একজন উল্লেখযোগ্য নারী দেবী চৌধুরাণী কোম্পানির শাসনামলে ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় রংপুর কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।[৪১] দীর্ঘদিনের মুসলিম শাসন, বিদেশি মুসলমানদের আগমন এবং মুসলিম দরবেশদের কার্যাবলীর দ্বারা বাংলায় অতি দ্রুত মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বহুদিন একসঙ্গে বসবাস করার ফলে হিন্দু ও মুসলমান একে অপরকে স্বভাবতই বেশ প্রভাবিত করে। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সুলতানি ও মুঘল আমলে বাংলায় শিক্ষাসহ বিভিন্ন অধিকার অভিজাত পরিবারের নারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সাধারণ পরিবারের নারীরা এ সময় জীবনের নানা দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ে। কিন্তু সার্বিকভাবে বাংলার সমাজ উন্নয়নের জন্য ধনী গরীব নির্বিশেষে সকল নারীর অগ্রগতি প্রয়োজন ছিল।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে (১৭৫৭-১৮৫৭) জাতিগত আত্মিক বৈশিষ্ট্যের অধঃপতন ও অবক্ষয় ঘটে। সুলতানি ও মুঘল শাসনামলে ধর্মের নামে পর্দাপ্রথা এবং পিতৃতন্ত্রের ভিত্তিকে মজবুত করার জন্য নারীকে দমিয়ে রাখার প্রবণতা থাকলেও তখন বাংলার নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু ইংরেজ শাসন শুরু হলে নারী উন্নয়নের এ ধারা ব্যাহত হয়। এ সময় পুঁথি সাহিত্যের নমুনায় মেয়েদের অধঃপতিত রূপে চিহ্নিত করা হয়। পুঁথি লেখকগণ মেয়েদের অবিশ্বাসী এবং নীচু মানসিকতার অধিকারী হিসেবে চিত্রিত করেছেন।[৪২] মূলত ১৭৬৫ সালে ইংরেজ কর্তৃক দিওয়ানী গ্রহনের মধ্যদিয়ে বাংলার রাজনীতির সাথে সাথে সমাজের চিত্রও বদলে যায়। এ সময় গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে নানা প্রথা ও বিধিনিষেধ জারি করে প্রকারান্তরে নারীকে ঘরে অবরুদ্ধ করে শোষণ ও নির্যাতন করা হয় এবং সামাজিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিকভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়। মধ্যযুগে সমাজের নানা অসঙ্গতির মধ্যে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, অভাবের তাড়নায়, ঋণের দায়ে, দুর্ভিক্ষের কারণে (ছিয়াত্তরের মনন্তরে), অন্নাভাবে কন্যাসন্তানকে বিক্রি করা হয়েছে। অবশ্য সে সময় মানুষ নিজেকে এককভাবে বা সপরিবারে, কিংবা নিজ পুত্র ও দাস-দাসীকেও বিক্রি করেছে। কোন কোন সময় মহাজনদের কাছে স্ত্রীকে এবং দাসীকন্যাকে বিয়ের জন্য বিক্রি করা হয়েছে।[৪৩] উল্লেখ্য অল্পবয়সী এবং যুবতী মেয়েদের বিক্রয়মূল্য বেশি ছিল, যা সমাজে মেয়েদেরকে অধস্তনতার নিকৃষ্ট পর্যায়ে পৌঁছে দিত। তবে এ ধরনের দৃষ্টান্ত অধিকতর কম মাত্রায় বলবৎ ছিল।

বাঙালি নারীর পতিভক্তি সম্পর্কে প্রায় সকল ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্বরোপ করা হয়েছে। *রামায়ণে*র সীতা ও *মহাভারতে*র সাবিত্রী নারিত্বের বিশেষ করে সতিত্বের অনুকরণীয়

দৃষ্টান্ত হিসেবে আদৃত হয়েছে। দৌলতকাজীর *সতী ময়না ও লোরচন্দ্রানী*তে এবং *মৈমনসিংহ গীতিকার* মহুয়া, মলুয়া ও দেওয়ান মদিনায় পাতিব্রত্যের পরিচয় মিলে।[৪৪] তবে মধ্যযুগে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনিভিত্তিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ব্যাপক ধর্মান্দোলন হিন্দু সমাজে পতিভক্তির ধারণাকে অনেকটা শিথিল করে দেয়। কিন্তু মুসলিম সমাজে এটি দৃঢ় ছিল। শেখ সুলায়মানের *অসিয়তনামায়* (ষোলো শতক) বলা হয়েছে, পরপুরুষের সাথে নারী যদি 'পরদার' করে এমনকি সে পরপুরুষকে দেখে, তার সাথে হাসাহাসি করে, তার দ্রব্য খায়, সেজেগুজে তাকে মুখ দেখায়, তাহলে নরকের আগুনে ছারখার হওয়া তার জন্য অনিবার্য।[৪৫] এছাড়া সৈয়দ নূরুদ্দীনের *দাকায়েকুল আখবার* বা আবদুল্লাহর *দোককাতুন নাছেহীন* (আঠারো শতক) গ্রন্থে উপদেশ দেওয়া হয় যে, স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি সর্বদা ভক্তিভাবাপন্ন থাকতে হবে; স্বামীর আহবানে সময়োচিত সাড়া দেওয়া তার কর্তব্য; স্বামীর অনুমতি না নিয়ে বাইরে যাওয়া পাপ এবং স্বামী রাগ করলেও স্ত্রী উত্তর দেবে না। স্ত্রীদের সতর্ক করে দিয়ে বলা হয় যে, স্বামীর প্রতি কটূক্তি করলে জিহবা সত্তর গজ লম্বা হয়ে যায় এবং স্বামীকে দুর্বল ও দরিদ্র বলে অভিহিত করলে সত্তর বছরের পুণ্য নষ্ট হয়।[৪৬] অর্থাৎ ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে নারীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখার দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। আবার মুঘল আমল থেকে শুরু করে উনিশ শতক পর্যন্ত নারী পুরুষে নৈতিকতার বৈষম্য প্রচলিত ছিল। ঘরের স্ত্রীর সতিত্ব সম্পর্কে সমাজ ছিল কঠোর। পর্দার আড়ালে বন্দি করে রেখে বলা হতো স্ত্রী হবে একজন পুরুষ অর্থাৎ স্বামীর প্রতি একমন, একপ্রাণ। কিন্তু স্বামীরা স্ত্রী-অন্তঃপ্রাণ নয়। মুঘল আমলে বাদশাহ, নবাব, আমীর-উমরাহ, জমিদার, জায়গিরদার, রাজকর্মচারী, সেনানায়ক ও ধনী ব্যবসায়ী প্রকাশ্যে বাইজি রাখতো। আলাদা বাড়ি তৈরি করে তারা রক্ষিতা পালন করতো এবং সেখানে মদ্যপান, সংগীতচর্চার সাথে নারীসঙ্গ করতো।[৪৭] বাড়িতে স্ত্রী রেখে কলকাতার বাবুরা রক্ষিতা ও উপপত্নীর সাহচর্যে জীবন কাটাত। ভবানীচরণের 'নববাবু বিলাস' (১৮২৩) থেকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'(১৮৪০) প্রকাশ অবধি গৃহবধূদের প্রতি স্বামীদের চরম ঔদাসীন্যের অজস্র প্রমাণ মেলে। এসব পুরুষের অনেকেই রক্ষিতার জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ নিয়ে বল্‌গাহীন প্রতিযোগিতা চালাতেন।[৪৮] তৎকালে পুরুষের নৈতিক চরিত্র উন্নত হওয়া প্রয়োজন ছিল। অন্যদিকে ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীকে সমাজে কোনঠাসা করে রাখাও ধর্ম বিরোধী ছিল।

সার্বিকভাবে মধ্যযুগে বাংলায় মুসলিম শাসন শুরু হওয়ার পর ইসলাম ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী মেয়েদের অধিকার বা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু পর্দাপ্রথার নামে মেয়েদের গৃহে বন্দী করে রেখে তাদেরকে প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এমনকি বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে, মধ্যযুগে মুসলমান সমাজে কঠোর পর্দাপ্রথার কারণে বিয়ের জন্য পাত্র-পাত্রী নির্বাচন সম্পূর্ণরূপে অভিভাবকদের উপর বিশেষ করে পুরুষের উপর ন্যস্ত ছিল। মুসলমান পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষরা বিবাহ স্থির করতেন; তবে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নারীরা চাক্ষুষ কনেকে দেখে তার রূপগুণ সম্পর্কে মতামত দিতেন। উল্লেখ্য উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে এসবের বিরুদ্ধে অনেকে প্রতিবাদ শুরু করে।[৪৯] কেননা শৈশবে পিতৃগৃহে, বাল্যকালে ও কৈশোরে স্বামীগৃহে অসম্মান ও অনাদর জুটত প্রায় সব বাঙালি নারীর ভাগ্যে। বৈধব্য ও সাপত্ন্যের অভিশাপ ছাড়াও অসম বয়স্ক বিবাহ, স্বামীর দায়িত্বহীনতা প্রভৃতির আঘাতেও জর্জরিত হতো নারীর জীবন। তৎকালে হিন্দু সমাজের ন্যায় মুসলমান সমাজেও নারীশিক্ষার হার ছিল অত্যন্ত নগণ্য। লেখাপড়া শিখলে হিন্দু নারী বিধবা হয় এমন বিশ্বাস প্রচলিত ছিল উনিশ শতকের তৃতীয় দশকেও। আবার শশুর বাড়ির নির্মম পরিবেশে বধূ নিজেকে দাসীর

অধিক কিছু ভাবতে পারত না। পরিবারে বিভিন্ন রকমের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর মতামতের কোনো মূল্য ছিল না। গৃহকাজে নিষ্ঠা ও নৈপুণ্য দেখিয়ে 'ভাল বউ' হওয়ার প্রত্যাশায় নারীরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রম করে যেতেন।[৫০] আঠারো শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের শুরুতে মুসলিম নারীর ন্যায় হিন্দু সমাজেও নারীর মৌলিক মানবাধিকার বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। এ প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায় বলেন, 'একই সঙ্গে রান্না করতে পারে শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে এবং বিশ্বস্ততার সাথে ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে এরূপ উপযোগী জন্তু ব্যতীত মহিলাদের আর কিছু বলে বিবেচনা করা হতো না'।[৫১] অবরোধপ্রথা, নারীসমাজে শিক্ষার অনগ্রসরতা ও বাল্যবিবাহ এ সবই উনিশ শতকে বাংলার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কে মধ্যযুগীয় আর্থ-সামাজিক অবস্থানে নিশ্চলাবস্থায় রেখে তাদের প্রগতির পথকে রুদ্ধ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কঠোরতা এবং নারীর প্রতি সমাজের ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গির অভাব বাঙালি নারীর পশ্চাৎপদ অবস্থার জন্য দায়ী ছিল।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, মধ্যযুগে বাংলার রাজনৈতিক উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও শাসন ব্যবস্থায় বহু পরিবর্তন ঘটলেও দীর্ঘদিন ধরে সমাজব্যবস্থার কাঠামোতে কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় নারীর মর্যাদা ও অধিকারের উন্নয়ন ঘটেনি। এ সময় অভিজাত পরিবারের নারীরা গৃহ অভ্যন্তরে শিক্ষাসহ নানা সুযোগ সুবিধা পায় এবং সীমিত পরিসরে তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু সাধারণ পরিবারের নারীরা অবমাননার শিকারই বেশি হয়েছেন। নারী বিক্রি হয়েছে কখনও বিবাহের নামে স্ত্রীরূপে, কখনও নর্তকী-বাইজিরূপে, কখনও পূর্ণতর দাসীরূপে। এক স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী দাসী ক্রয়ের কথা পর্যটক ইবনে বতুতার বিবরণ থেকেও জানা যায়। উপরন্তু বাঙালি সামাজের অবরোধপ্রথা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল নারীর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। অবগুণ্ঠনকে সতিত্ব এবং পর্দার নামে অবরোধপ্রথাকে কূলমর্যাদা জ্ঞাপনের অভিজ্ঞান করে তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর বিশেষ করে উনিশ শতকে এসে বাংলার নারীদের সার্বিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় আরও বেশি শোচনীয় হয়। এ সময়ও পর্দাপ্রথার কঠোরতা অভিজাত রক্ষণশীল পরিবারগুলিতে অতি মাত্রায় বলবৎ ছিল, অবরোধের কঠোরতা অনুসারে ভদ্রবংশের মাপকাঠি নির্ণয় করা হতো। যার গৃহে যত কঠোর অবরোধ প্রচলিত, তিনি তত ভদ্র বা শরীফ। সতিত্ব, পাতিব্রত্য ও নারিত্বের মহিমায় নারীসমাজকে বিভোর রেখে এবং ধর্মীয় অনুশাসনের নামে সমাজপতিদের চাপিয়ে দেওয়া বিধি-নিষেধ মেয়েদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে শৃংখলিত করে রাখে। বিয়ে, তালাক, বহুবিবাহ এ সকল ক্ষেত্রে পুরুষের যথেচ্ছাচার ধর্মের নামে চালু রাখার মাধ্যমে নারীর সামাজিক নিপীড়ন বেড়ে চলে। এ সকল অন্যায় প্রথা ও নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জাগে উনিশ শতকে। এ দেশীয়দের প্রতি ইংরেজদের মনোভাব, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবিত বাঙালি চেতনা, প্রাচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি ব্যক্তিদের মাধ্যমে উনিশ শতকের শেষের দিকে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের মাধ্যমে বাংলার সমাজে মানসিকতার ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রভাবে ধীরে ধীরে নারীর সার্বিক অবস্থার উন্নতি হওয়া শুরু করে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. আনিসুজ্জামান, *বাঙালি নারী সাহিত্যে ও সমাজে* (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০), পৃ. ১৩

২. পূরবী বসু, *প্রাচ্যে পুরাতন নারী* (ঢাকা : অবসর প্রকাশনা, ২০১৩), পৃ. ২৩

৩. Shahanara Hussain, *The Social Life of Women in Early Medieval Bengal* (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1985), p. 29

৪. পঞ্চানন তর্করত্ন (অনুদিত ও সম্পাদিত), *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ*, শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড (কলিকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৫৯৩

৫. *তদেব*, পৃ. ১৫২

৬. *তদেব*

৭. গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (ঢাকা : অবসর প্রকাশনা, ২০০৬), পৃ. ২৩২

৮. এ. কে. এম শাহনেওয়াজ, "বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য", *ধারাবাহিক লেকচার*-৩, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, তারিখ : ১০. ০৭. ২০১৯

৯. Momtazur Rahman Tarafdar, *Husain Shahi Bengal* (1494-1538A.D) A Socio-Political Study (Dhaka :University of Dacca, 1965), pp. 354-355

১০. Md. Akhtaruzzaman, *Society and Urbanization in Medieval Bengal* (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 2009), p. 240

১১. গোলাম মুরশিদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৩৫

১২. *তদেব*, পৃ. ১৬

১৩. Amitabaha Mukherjee, Reform and Regeneration in Bengal, 1774-1823 (Calcutta : Rabindra Bharati University, 1968), p. 204

১৪. ভারতচন্দ্র, *অন্নদামঙ্গল* (কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১৭৬৯), পৃ. ২২২

১৫. Parliamentary Papers (House of Commons) 1812-13, Vol. X, Calcutta, p. 29

১৬. ক্ষিতীশচন্দ্র (সম্পাদিত), *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, চতুর্থ খণ্ড, ১৯৭২, পৃ. ১৯৭-২০৬; উদ্ধৃতি, পূরবী বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৩

১৭. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস* (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৪), পৃ. ১৯

১৮. আনিসুজ্জামান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪

১৯. Deodhai Assam Buranji, Assam : The Department of Historical and Antiquarian Studies, 1932, pp. 26-27; Nagendra Nath Acharyya, The History of Medieval Assam : (from the thirteenth to the seventeenth century): a critical and comprehensive history of Assam during the first four centuries of Ahom rule, based on original Assamese sources, available both India and England (Guahati & New Delhi : Omsons Publications, 1984), p.122.

২০. সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তাবাতাবাঈ, *সিয়ার উল-মুতাখ্‌খেরীন*, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া অনুদিত (ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ১৯৮৯), পৃ. ২৭৫

২১. Md. Akhtaruzzaman, *op.cit.*, p. 234

২২. Walter M. Gallichan, *Women Under Polygamy*, 2019, p.119; উদ্ধৃতি, জ্ঞানেশ মৈত্র, *নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য* (কলকাতা : ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৮৭), পৃ. ১৮।

২৩. Amir Khusrau, *Ijaz-i-Khusravi* (Lucknow : Nawalkishore Press, 1876), pp. 120-121; Amir Khusrau, *Mathnawi the NUH SIPIHR* (Sultan Nameh), (Eng. tr. R. Nath & Faiyaz Gwaliar), *India As Seen* (Jaipur : Historical Research Documentation Programme, 1981), p. 196.

২৪. H. Verelest, *A View of the Rise and Progress of the Present State of the English Government in Bengal* (London : J. Nourse, 1772), p. 108; K. K. Datta, Alivardi and His Times (Calcutta : World Press Private Limited, 1963), p. 89.

২৫. সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তাবাতাবাঈ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮২

২৬. ভারতচন্দ্র, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৫

২৭. Jadunath Sarkar, *Bengal Nawabs* (Calcutta : Asiatic Society, 1952), p. 153.

২৮. M. A. Rahim, *Social & Cultural History of Bengal*, Vol. II (Karachi : Pakistan Historical Society, 1967), p. 167.

২৯. গুলবদন বেগম, *হুমায়ুননামা*, মোস্তফা হারুন অনুদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৮), পৃ. ৫৮।

৩০. এসকল দাসদাসীদেরকে তিনি আসামের এক পার্বত্য অঞ্চল হতে বন্দি করে আনেন। মীর্জা নাথান, *বাহারিস্তান-ই-গায়বী*, খালেকদাদ চৌধুরী অনুদিত (ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ২০১২), পৃ. ৬৬৬-৬৬৮

৩১. Charles Stewart, History of Bengal (London : Cambridge University Press, 1813), p. 211.

৩২. Dr. Halwell, *Interesting Historical Documents*, Vol. I, p. 170; cited, Brajendra Nath Banerjee, Begams of Bengal (Calcutta : S. K. Mitra, 1942), p. 12

৩৩. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, তৃতীয় খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩), পৃ. ৫৮৫; সৈয়দ গোলাম হেসেন খান তাবাতাবাঈ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৮

৩৪. সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তাবাতাবাঈ নবাবগণের নাম উল্লেখ করেন- যথাক্রমে : নজম উদ্দৌলাহ (১৭৬৫-৬৬ খ্রি.); মুবারক উদ্দৌলাহ (১৭৬৬-৭০ খ্রি.) এবং সায়েফ উদ্দৌলাহ (১৭৭০-৯৩ খ্রি.)।

৩৫. এ. কে. এম শাহনেওয়াজ, *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ : সুলতানি পর্ব* (ঢাকা : প্রতীক প্রকাশন, ২০০২), পৃ. ৬৪-৬৫; খুহ Reese, 'Sultana Razia', Ruth Ashby And Deborah Gore Orhan (eds.), *In history : Women Who Changed the World*, Viking, 1995, pp. 34-36 ; David E. Jhones, *Women Warriors : A History*, Brassels, 2005, p. 112

৩৬. Jadunath Sarkar, *History of Aurangzib* (Calcutta : M.C. Sarkar, 1912), p. 278

৩৭. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩

৩৮. আনিসুজ্জামান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪

৩৯. *তদেব*, পৃ. ১৫

৪০. *তদেব*

৪১. উত্তরবঙ্গের জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরীর স্ত্রী দেবী চৌধুরাণীর বীরত্বের কথা সর্বজনবিদিত। অন্য একজন জমিদারের আক্রমণে তাঁর স্বামী ও পুত্র নিহত হলে তিনি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দস্যুদলে যোগ দেন এবং পরে তাদের নেতা নিযুক্ত হন। উল্লেখ্য ১৭৮০ সালে ব্রিটিশ বিরোধী যুদ্ধ পরিচালনা করতে গিয়ে দেবী

চৌধুরাণী নিহত হন। জনসাধারণ তাঁকে দেবীতুল্য মনে করত। কারণ তিনি ধনীর অর্থে গরীবের দুঃখ দূর করতেন। (মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. 12; K. K. Datta, op.cit., p. 247).

৪২. Sonia Nishat Amin, *The World of Muslim Women in Colonial Bengal* : 1876-1939 (New York, E. J. Brill, Lieden), 1996, p. 47

৪৩. পূরবী বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৭-১৫৮

৪৪. আনিসুজ্জামান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮-১৯

৪৫. সেলিনা হোসেন, বিশ্বজিৎ ঘোষ ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), *সাহিত্যে নারীর জীবন ও পরিসর* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৭), পৃ. ৪৯-৬৪

৪৬. মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০

৪৭. মাহমুদা ইসলাম ও বিলকিস রহমান, "পরিবার সনাতন থেকে আধুনিক", *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, সোনিয়া নিশাত আমিন সম্পাদিত (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০), পৃ. ৫৫

৪৮. শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* (কলিকাতা : এস. কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ১৯০৯), পৃ. ৫৫-৫৬; সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, *অন্দরে অন্তরে, উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রমহিলা* (কলকাতা : সাদার্ন অ্যাভিনিউ, ১৯৯৫), পৃ. ১৮-১৯

৪৯. Meredith Borthwick, *The Changing Role of Women in Bengal 1849-1905* (USA : Princeton University Press, 1984), p. 124

৫০. রাসসুন্দরী দেবী, *আমার জীবন*, (কলকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৫২; প্রবোধ কুমার সান্যাল, "মেয়েদের একাল-সেকাল", *আনন্দ বাজার*, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা (কলকাতা : ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৭৩

৫১. রাজা রামমোহন রায়, *রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী*, রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত (কলিকাতা : এস. এন, এস. আই, ১৬৮৭৩), পৃ. ২০৫